The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 145-164
ISSN 2306-3920

অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে মানুষ ও জগত : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মোঃ এলাম উদ্দীন*

[**সার-সংক্ষেপ :** এই প্রবন্ধে 'অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে মানুষ ও জগত' সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী দার্শনিকরা 'অস্তিত্ব' ও 'সারধর্ম' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষের সারধর্ম আগে পরে তার অস্তিত্ব। সমকালীন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে, মানুষের 'অস্তিত্ব' আগে পরে তার 'সারধর্ম'। অস্তিত্ব স্থির নয়, গতিশীল, সর্বদা পরিবর্তনের আধার। প্রতিমূহুর্তে ব্যক্তিসত্তা এক অবস্থা থেকে অন্য আর এক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অস্তিত্ব ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত- সে হয়ে নেই, সে হয়ে উঠবে; অস্তিত্ব সর্বদাই নিজেকে অতিক্রম করে চলেছে। ভবিষ্যৎরূপী এই ব্যক্তিগত 'অস্তিত্ব'-এর মধ্যে প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত অস্তিত্ব যে জগতে রূপায়িত তার মধ্যে যে স্বীয় সত্তাটি রয়ে গেছে 'আতঙ্ক' তাকেও সূচিত করে। এই জগতের সঙ্গে নানা সম্পর্ক ও উপযোগের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে যে স্বীয় সত্তা 'অস্তিত্ব' তারও দ্যোতক। এই সমীকরণের নিরিখেই বর্তমান প্রবন্ধে 'অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে মানুষ ও জগত' সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে।]

অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে যাঁরা নিজেদের দার্শনিক মতবাদ গড়ে তোলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল জগত ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে এবং সমগ্র জগত সম্পর্কে মানব মনে সৃষ্ট সকল প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র মানুষেরই। আর এসব প্রশ্নের উত্তরমালা রচিত হয়েছিল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য কলা এবং ধর্মশাস্ত্রসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। প্রাচীন যুগ থেকে সমকালীন যুগ পর্যন্ত মানুষ অবিরাম গতিতে জ্ঞান সাধনা করে চলেছে এবং পর্যায়ক্রমে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞান সাধনার যে কর্তা আছে তার অন্তরের খবর কেউ রাখে কি? উত্তরে বলা যায় প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা, ইচ্ছা ও অনুভূতি নিয়ে গড়ে ওঠে তার নিজস্ব চরিত্র, যা তাকে স্বাতন্ত্র দেয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা যুক্তির পরিবর্তে অনুভূতি ও কর্মের মাধ্যমে সকল মানব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ বিরোধী ছিলেন। কারণ, ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ উভয়ই মানুষের বাস্তবতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিহ্ন করেছে। অস্তিত্ববাদ দৃশ্যমান মানুষের দায়িত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তাই অস্তিত্ববাদীরা হেগেলের সর্বব্যাপী জ্ঞানবাদ ও বিশ্বগ্রাসী পরমসত্তাবাদের রেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

দর্শনের ইতিহাসে আস্তিক ও নাস্তিক নামে অস্তিত্ববাদের দু'টি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সোরেন কিয়ের্কেগার্ড, কার্ল ইয়েসপার্স ও গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের চিন্তাধারা আস্তিক অস্তিত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত। মানুষকে বড় করে তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসী। কিয়ের্কেগার্ডের মতে, প্রতিটি

---

* **ড. মোঃ এলাম উদ্দীন :** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

মানুষের উচিত নীতিভিত্তিক ধর্মীয় জীবন-যাপন করা এবং প্রাথমিকভাবে জগতে অবস্থিত সত্তা হিসেবে এবং পরিশেষে ঈশ্বরাশ্রিত সত্তা হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করা। কার্ল ইয়েসপার্স ও গ্যাব্রিয়েল মার্সেল এই মতের সমর্থক ছিলেন। ফ্রেডারিক নীট্সে, জ্যাঁ-পল সার্ত্রে এবং আলবার্ট ক্যামু নাস্তিক অস্তিত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত। তাঁদের কাছে মানুষই সব, ঈশ্বর মৃত। মার্টিন হাইডেগারকে কোন আখ্যায়ই আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ, ঈশ্বর সংক্রান্ত সরাসরি প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদাসীন। নাস্তিক ধারার অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ নিজেদের মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করেননি। তাঁরা মানুষের ব্যক্তিজীবনের বাস্তব দিকটির তাত্ত্বিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। জগতে অবস্থিত মানবসত্তার বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিজীবনের নানা সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক আলোচনাই তাঁদের মতবাদে প্রাধান্য পেয়েছে। এসব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা চেতনার বিষয়মুখীনতার কথা বলেছেন, নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। এ্যাডমন্ড হুর্সাল সর্বপ্রথম ঘটনাসারতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'চেতনার বিষয়মুখীনতা', 'আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কাজেই বলা যায় যে, হুর্সালের এই তত্ত্ব অস্তিত্ব বিষয়ক দর্শনের উৎস। এই প্রবন্ধে আরো দেখানো হয়েছে যে, প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত সকল ভাববাদী ধারণাই সারধর্ম অস্তিতত্ত্বের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান এবং অগ্রগামী। অস্তিত্ববাদী প্লেটো থেকে হেগেল পর্যন্ত সকল ভাববাদীদের কঠোর সমালোচনা করে তাঁদের সূত্রে বিপরীত সূত্রটির (অস্তিত্ব সারধর্মের অগ্রগামী) বাস্তবতা প্রমাণ করেন। অস্তিত্ববাদ হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে হেগেলীয় দর্শনের কঠোর সমালোচনার ভিত্তিতেই অস্তিত্ববাদী মতবাদের উদ্ভব ঘটে। ডেনমার্কের প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) এই মতবাদেরর উদ্ভাবক ও জনক। এই প্রবন্ধে মানুষ ও জগতের সম্পর্ক, সত্তা ও সত্তাভাব এবং মানবতাবাদ হিসাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সমকালীন সময় থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে তিনি এই মতবাদের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিয়ের্কেগার্ডের অনুগামী দার্শনিকগণ বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ও দর্শনের মাধ্যমে এই মতবাদের সারমর্ম প্রকাশ করে মতবাদটিকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। চিরাচরিত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন, রীতিনীতি, প্রথা ও মূল্যবোধ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও রূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে এবং জীবনকে সাবলীল করার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা তার প্রতিও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দুঃখ মুক্তির স্বাধীন প্রয়াসই ছিল মূর্ত মানব জীবন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মূল লক্ষ্য ছিল দুঃখ এবং সমস্যা জর্জরিত প্রতিটি মানুষের আশা, আকাঙ্খা, চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতির পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া। অস্তিত্ববাদী দর্শন মানবকেন্দ্রিক দর্শন। জগতে অবস্থিত সত্তা হিসেবে মানুষ দ্রষ্টা নয়, কর্তা ও স্রষ্টা। দুঃখভাগের মাধ্যমে অন্তরের গভীরতম স্তরে গিয়ে দার্শনিকসুলভ আত্মোপোলব্ধি করা এবং আত্মোপোলব্ধি প্রসুত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ যীশু খ্রিষ্ট, হিন্দু সম্প্রদায়ের মহান দেবতা স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী চৈতন্যদেব এবং বুদ্ধ সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ মহামতি গৌতম বুদ্ধের মতো মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মহাপুরুষ যুগে-যুগে, কালে-কালে মানবপ্রেমের বাণী জনসাধারণের কাছে প্রচার করেছেন। অসাধারণ কাজের জন্য অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রয়োজন; প্রকৃত মানবপ্রেমিক হতে গেলে তাঁকে মহামানব হতে হবে। সাধারণ মানুষ নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করে মাত্র। যে-কোন অর্থেই হোক, আত্মোপোলব্ধির পথ সকলের জন্যই খোলা আছে। কিন্তু সে পথে যেতে পারে কজন। জগতে অবস্থিত মানবসত্তার জীবনদর্শন তথাকথিত কোন ধারাবাহিক আলোচনা মাত্র নয়। এরই প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে 'অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে মানুষ ও জগত' সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অস্তিত্ব বিষয়ক দর্শন মানুষেরই দর্শন, মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করেই এই দার্শনিক মতবাদটি গড়ে উঠেছে। এ জগতে মানুষের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে সে নিষ্ক্রিয় এবং অসহায়। এ ক্ষেত্রে তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই এবং এই জগতে তার আবির্ভাবের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। এ অর্থে সে নিষ্ক্রিয়। জন্মগ্রহণ করার পর সে উপলব্ধি করে যে, নানারকম দুঃখ-দুর্দশা এবং বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ এক পরিবেশের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এসব দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পাবার পন্থা আবিষ্কার ও তার জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের পথ নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সে সক্রিয়। প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ জন্মগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় এবং জীবনের দুঃখ মোচন ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সে সক্রিয়। দুঃখময় বিপদসঙ্কুল জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের পক্ষে আবশ্যিক। দুঃখ-ভারাক্রান্ত, সমস্যা-জর্জরিত জীবন তার কাছে বোঝা স্বরূপ। জীবের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুর শীতল স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত সে জীবনযন্ত্রণায় ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, উত্যক্ত ও বিহ্বল। এই দুঃখ-দুর্দশা সমস্যা জর্জরিত মানুষটিই অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে মানুষ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সবকিছুই ব্যক্তিসত্তার বর্তমান পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে নিজের কাছে। অস্তিত্ববাদী চেতনা মানুষের জীবন সম্পর্কে সুপ্ত কথাই বলার চেষ্টা করেছে। অস্তিত্ববাদী দর্শনে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী সার্বিক ধারণারূপে 'মনুষ্যত্ব'-এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কেন না, প্রত্যেক মানুষ তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এক একটি মূর্ত ব্যক্তিসত্তা এবং অস্তিত্বের ভিত্তি এই জগত থেকে অবিচ্ছেদ্য। এ প্রসঙ্গে বস্তুগত ভাববাদীদের ধারণা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, অদ্বিতীয় পরমসত্তা হলো চরমতত্ত্ব, যে তত্ত্বের সাহায্যে তাঁরা সমস্ত মূর্ত বিশেষের জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করেছিলেন। আধুনিক যুগের শেষ বস্তুগত ভাববাদী দার্শনিক জর্জ উইলহেলম ফ্রেডারিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)-এর ভাববাদী দর্শনের প্রতিক্রিয়া যে জার্মান দার্শনি শোপেন হাওয়ার, ফ্রেডারিক নীট্‌শে এবং ডেনমার্কের আস্তিক্যবাদী ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক সোরেন কিয়েৰ্কেগার্ডের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্মরণীয় যে, এই প্রতিক্রিয়ার উৎস হেগেলীয় দর্শনে নয়, ভাববাদী দর্শনের প্রক্রিয়া নিহিত ছিল প্লেটো (৪২৮ খ্রি.পূ-৩৬৮ খ্রি.পূ)-র 'Republic' গ্রন্থে। [সঞ্জীব ঘোষ, ১৯৮৬:২] প্লেটোর কাছে জগত মূলত: সার্বিক রূপের জগত এবং এই রূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়েই মানুষ পর্যায়ক্রমে নিজেকে জানতে পারে। মানুষ প্লেটোর কাছে এই রূপেরই প্রকাশমাত্র আর অস্তিত্ব এই সত্তার উপাদান। জার্মান বিচারবাদী দার্শনিক ইম্যানুয়ের কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর দর্শনের মৌল প্রশ্নগুলোকে জ্ঞানতত্ত্বের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে বলেছিলেন, বস্তু তার স্বরূপে আমাদের কাছে শুধু অজ্ঞাত নয়, অজ্ঞেয়ও। মানসিক ক্রিয়ার কতকগুলো সাধারণ সূত্র দ্বারা দৃশ্যমান জগতের বিন্যাস ও অর্থারোপের মাধ্যমে জ্ঞানবস্তুর সৃষ্টি হয় স্বীকার্য এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান হয়ত তাতে ব্যাখ্যাত হতে পারে। দর্শনের ক্ষেত্রে কান্টীয় রীতি দৃশ্যমান জগতকে যুক্তির সূত্রে ব্যাখ্যা করার সম্ভবত: সর্বোত্তম প্রয়াস। কিন্তু এই যুক্তি ছিল আপেক্ষিক, একান্তই শর্তসাপেক্ষ এবং দৃশ্যমান জগতের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। কান্টের 'The critique of pure Reason' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ার বলেছিলেন :

> 'The principle of sufficient reason does not possess an unconditional validity, before outside of and above the world. it is relative and conditional and valid only in the sphere of phenomeno.' [Arthur Schopenohauer, 1934:72]

এই গ্রন্থে পরমসত্তার দ্বান্দ্বিকতত্ত্বে কান্ট ঈশ্বর, আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন। তিনি ঈশ্বর, অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)-এর মতে, কান্ট ছিলেন মূলত: সংশয়বাদী। পরমসত্তার জ্ঞান হিসাবে তার মূল্য সম্পর্কে হেগেল তাঁর দার্শনিক বীক্ষায় সত্তা ও চিন্তার তদাত্ম ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভাববাদী

দর্শনের একটি চূড়ান্ত রূপ উপহার দিয়েছিলেন বিগত শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাজগতকে। কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তার কাঠামোর মধ্যে অস্তিত্বমান বস্তুজগতের কাঠামোর স্বরূপ পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত এই হেগেলীয় তত্ত্বের ভিত্তিই চিন্তানির্ভর। অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার পক্ষে এই তত্ত্ব একান্ত অনুপোযোগী। কান্টীয় অন্বেষা প্রকৃত সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সংশয় সৃষ্টি করেছিল হেগেল তা নিরসনে কার্যত: ব্যর্থ হয়েছিলেন। নিত্যের অন্বেষণে দার্শনিক সব সময়ই কোনো তাত্ত্বিক আদর্শের অনুসরণে রচিত জগত সম্পর্কিত ধারণায় অনিবার্যভাবে উপনীত হন। হেগেলীয় চিন্তাধারা এই ধরণের দর্শনের সম্ভবত: সবচেয়ে বর্ণাঢ্য প্রকাশ। হেগেলের দর্শনচিন্তা এক চূড়ান্ত আদর্শরূপী নিত্যেরই সন্ধান। হেগেলের ধারণায় জগতের প্রকৃতি হচ্ছে আদর্শস্বরূপ। এই আদর্শের দুই রূপ- প্রথমত: স্বরূপে অধিষ্ঠিত রূপ, দ্বিতীয়টি তার নিজের অভিব্যক্তির অন্যরূপে। কিন্তু উভয়ইরূপ ভাবধর্মী। আদর্শের স্বরূপে অধিষ্ঠিত রূপকে তিনি বলেছিলেন চূড়ান্ত আদর্শ। সমস্ত চিন্তাই এখানে সামঞ্জস্যে বিধৃত। হেগেলের মতে, মৌলিক সত্তা সুসংবদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক চিন্তার সমষ্টি। জগত প্রকৃতির মৌলিক সত্তা থেকে স্বতন্ত্র। চূড়ান্ত আদর্শের বাস্তব অভিব্যক্তির মাধ্যমে এই দৃশ্যমান জগত ব্যাখ্যাত হতে পারে। জড়জগতের বৈজ্ঞানিক বিবর্তন নয়, আদর্শের আভ্যন্তরীন শক্তির ক্রিয়াতেই তার রূপ এভাবে পরিবর্তিত হয়। বিশুদ্ধ চিন্তার রীতিকে তিনি জগত ব্যাখ্যার সর্বোত্তম উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন সার্বিক সংজ্ঞার সম্পর্কের বিমূর্ত রূপ দিয়েই বিশুদ্ধ চিন্তা গঠিত হয়। [Satish Chandra Chatterjee, 1964 : 44] এই বিশুদ্ধ চিন্তাই হেগেলের মতে, জগতের মৌলিক সত্তার সারমর্ম।

হেগেলের মতে, একমাত্র চিন্তায় এই জগতকে তার স্বরূপে প্রকাশ করে। কান্ট ভাবকে জ্ঞানের প্রকারের উৎস বলে মনে করেছিলেন। কান্টীয় দার্শনিক রীতির অনুসরণে জ্ঞানের প্রকার তাই বিষয়ীভিত্তিক। হেগেলের যুক্তিতে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল অজ্ঞাবাদ। মানসিক অভিজ্ঞতার বহির্ভূত জগতপ্রকৃতির ক্ষেত্রে এই কান্টীয় প্রকারতত্ত্ব অপ্রযোজ্য। হেগেলের মতে, যে জ্ঞানরূপ ও প্রকারের মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তা বিকশিত হয়েছিল তা শুধুই মানসিক অভিজ্ঞতার মর্ধেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃত জগতসত্তার প্রকৃতি ও গঠনের মধ্যেই তার প্রকাশ। [Ibid, P.44] হেগেল একটি অভিনব দার্শনিক রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। দর্শনের ইতিহাসে তা 'দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি' নামে পরিচিত। এই রীতি অনুসারে প্রথমধাপে চিন্তা ইতিবাচক। দ্বিতীয় ধাপে চিন্তা এই অবস্থা থেকে বিপরীত অবস্তায় উন্নীত হয় এবং পরবর্তী তৃতীয় ধাপে দুই অবস্থার সমন্বয়ে একটি ব্যাপকতর সমন্বয়ধর্মী ধারণায় উন্নীত হয়। হেগেল এই রীতির প্রয়োগ করে প্রকার থেকে প্রকারান্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এভাবে তিনি সর্বনিম্ন প্রকার সত্তা থেকে সর্বোচ্চ প্রকার চূড়ান্ত পরমসত্তার ধারণায় তাঁর দর্শনের ব্যাপকতম অধিষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন। একই দ্বান্দ্বিক রীতিতে ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তুজগতের বিকাশও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হেগেল তাঁর যুগান্তকারী দর্শনে দেখিয়েছিলেন কিভাবে মানব ইতিহাস থেকে শুরু করে মানুষের সমগ্র জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের অভিব্যক্তি এই 'দ্বান্দ্বিক' রীতিকে অনুসরণ করে চলেছে। হেগেলের ভাববাদী দর্শনের এই ছিল সারমর্ম। প্রতীচ্যের ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তা হেগেল চেতনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে সমকালীন প্রতীচ্যের অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল ভাবধারার আলোচনায় প্রবেশ করবো।

ডেনমার্কীয় ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ঐতিহ্য-লালিত দার্শনিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল, এ প্রসেঙ্গ Editor A. B. Drachmann বলেন : 'Most systematisers in relation to their fare lilee the man who build a huge place and himself lives next door to it in a barn' [Soren Kierkegaard, 1920, P.82] হেগেলীয় যুক্তিশাস্ত্র তাঁর কাছে পরিতাজ্য। হেগেল তাঁর চূড়ান্ত প্রজ্ঞার ধারণাকে সমগ্র অস্তিত্বের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। অথচ 'ব্যক্তি' রূপী অস্তিত্ব, যে ব্যক্তি অসংখ্য স্ববিরোধীতায় আকীর্ণ তার মধ্যেই সত্যের অধিষ্ঠান, কোনো

বিমূর্ত ভাবের মধ্যে সত্যের অধিষ্ঠান নেই। অস্তিত্ব থেকে সারমর্ম- এই ছিল সত্যের পথ। কারণ তাঁর মতে, সত্য ব্যক্তি অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সকল প্রয়াস ও অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে আমরা নিয়ত এই সত্যের মুখোমুখী হই এবং সত্যকে আমাদের প্রকৃতির অঙ্গীভূত করি। হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, প্রথম সূত্র মানব চেতনা, কারণ, আমাদের ভাবের মাধ্যমে আমরা স্থির করি, কোথায় থেকে শুরু করবো ? সত্যের পথে প্রতিটি পদক্ষেপই আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের লক্ষ্য। কিয়ের্কেগার্ডের মতে, মানুষের প্রকৃত চেতনা থেকে সংস্কৃত চেতনা, সংস্কৃত চেতনা থেকে নৈতিক এবং নৈতিক চেতনা থেকে ধর্মীয় চেতনায় উত্তরণ কোনো সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত নিয়মানুগ যুক্তিনির্ভর অগ্রসরের ফল নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই উত্তরণ জগতকে নতুন করে দেখার একটি কার্যকারণ সূত্রবিহীন পদক্ষেপ, কিয়ের্কেগার্ডের ভাষায় যাকে বলে 'Leap' । আস্তিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড খ্রিস্টীয় সত্যকে মানতেন। মানুষ মাটির পৃথিবীকে হারিয়েও যদি নিজেকে না হারায় তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার যেটুকু থেকে যায় তা কি? তাই একটি মূল প্রশ্নে তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসা কেন্দ্রীভূত : What is the self that remains if a person has lost the whole world and yet not lost himself? [Majoric Greene, 1959:38] কিয়ের্কেগার্ডের কাছে এই ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ছিল 'That very real inner impassioned feel of self, The self beyond the transcendental unity,' [Majoric Greene, Ibid P:38] খ্রিস্টীয় সত্যে আস্থাবান কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তিসত্তার অন্তরাশ্রীয় এই উন্মুখ অনুভবটুকু নিয়েই ঈশ্বরের মুখোমুখী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে জীবন পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের দিকে এক দীর্ঘ তীর্থযাত্রা। মানুষ একমাত্র ঈশ্বরের মুখোমুখি হলেই নিজেকে খুঁজে পাবে, কারণ, ঈশ্বরের কাছেই মানুষের অন্তিম একাকিত্ব। এ প্রসঙ্গে Majoric Greene বলেন:

> 'Only before God is a man really himself; because it is only before God that he is Finally and irretrievably alone.' [Majoric Greene, 1959:38]

ঈশ্বর থেকে মানুষের যে অসীম দূরত্ব। এই দূরত্বের উপলব্ধিই একদিকে যেমন কিয়ের্কেগার্ডের ধর্মীয় চেতনার মূলসূর অন্যদিকে তেমনি তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎস।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের অপর জনক ফ্রেডারিক নীট্সে (১৮৪৪-১৯০০)র কাছে কিন্তু ঈশ্বর মৃত। খ্রিস্টান ঈশ্বরের পরিবর্তে তিনি 'অতিমানবের' ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই অতিমানব তার অমিত শক্তিবলে নিজেকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা রাখে। এভাবে খ্রিস্টানদের জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে ঈশ্বরবিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি জগত এবং জাগতিক জীবনের মূল্যকে পূন:প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'ঈশ্বরের মৃত' বিষয়ে নীট্শের অভিমত প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর রচনাতে। 'ঈশ্বরের মৃত' সম্পর্কে তাঁর রচিত 'Beyond Good and Evil' গ্রন্থে বলেন : 'Good is dead! God remains dead! And we have killed him.' [Friedrich Nietzsche, 1967:46] এই অর্থে 'ঈশ্বরের মৃত' মানুষকে মুক্তিদান করে। কারণ, 'ঈশ্বরের মৃত' হলে 'শূন্যতাবাদের সূচনা হয়। মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে ঈশ্বরহীন একটি অবাস্তব জগতের প্রেক্ষাপটে, যার নীতিগুলো অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে আবার ধ্বংস হচ্ছে, কারণ মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। কিয়ের্কেগার্ডের মতো নীট্শের দর্শনও একটি কুটাভাসে পরিণত হয়- কারণ নীট্শের দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং দার্শনিকেরই বিলুপ্তি ঘটেছে। মানবিক কামনা-বাসনার অনুভূতিময় জীবন নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির সর্বগ্রগণ্যতা কিয়ের্কেগার্ডের মতো তিনিও অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, চিন্তা এই সব অনুভূতির পারস্পরিক আত্মসম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। যুক্তি বা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন ও জগত সম্পর্কে সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের ধর্মীয় আস্তিকতা ও নীট্শের নাস্তিক্যবাদী দর্শন এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছিল ইয়েসপার্সের স্বাতিক্রমণের দর্শনে। কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিত্ববাদে ঈশ্বরকে যেমন পূর্বানুমান দ্বারা স্বীকার

করে নেওয়া হয়েছিল তেমনি নীট্শে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণার পূর্বানুমান থেকেই অস্তিস্তবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

কার্ল ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯) এ ধরণের কোনো পূর্বানুমান থেকে অগ্রসর হননি। অতিক্রমণের মধ্যেই তিনি তাঁর অস্তিত্ববাদের আশ্রয় খুঁজেছিলেন এবং জীবনের বন্ধুর পথেই এই অতিক্রমণের সন্ধান তিনি করেছিলেন। জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল ইয়েসপার্স তাঁর রচিত 'The Perennial scope of philosophy' গ্রন্থে মানুষ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। মানুষ যা দেখে, শোনে, তাই বাস্তব। এই বাস্তবাতিরক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের আছে। তবে অন্যান্য বস্তু বা প্রাণীর মতো মানুষও সসীম। তথাপি তাদের সসীমতার সঙ্গে মানুষের সসীমতার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তিনি গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের (৫৮০-৫০০ খ্রি:পূ) মতো সংখ্যা দিয়ে জগতের যাবতীয় বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন । সুতরাং জগতের মূলে ছিল এই সংখ্যা। সংখ্যার ছিল সসীমতা ও অসীমতা। এই অসীমকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না। সংখ্যা অসীম। অসীম ও সসীম বিপরীত শক্তি এবং প্রকৃতি এই দুই বিপরীত শক্তির মিলনের ফল। জগত এবং জগতের বিভিন্ন বস্তুর পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে দার্শনিকরা অস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরিবর্তনকে সমস্যা বলে মনে করেননি। পরিবর্তন ঘটছে এই কথাই সত্য, তার মধ্যে তাঁরা চিন্তার কিছু দেখেননি এবং গবেষণার বিষয় বলেও মনে করেননি। [রবি রায়, ১৩৬৫:৭] প্রোটাগ্রোসের মতোই অস্তিত্ববাদীরা মনে করেছিলেন যে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সাপেক্ষে জগতের সবকিছুই স্বীকৃতি পায় একমাত্র মানুষের জন্য এবং এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের মূল্যায়ন হয়। মানুষের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। এরই ধারাবাহিকতায় কার্ল ইয়েসপার্স তিন রকম সত্তার কথা বলেছিলেন বহির্জাগতিক সত্তা (Being there), স্বকীয় সত্তা (Being-oneself) এবং স্বরূপ-সত্তা (Being-in itself)। তাঁর মতে, এই তিন ধরণের সত্তা পরস্পর পৃথক ও বিচ্ছিন্ন। বহির্জাগতিক সত্তা বলতে তিনি বাস্তব দৃশ্যমান জগতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। স্বকীয় সত্তা বলতে মানবসত্তাকে এবং স্বরূপ সত্তা বলতে পরমসত্তা ঈশ্বরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। বহির্জাগতিক সত্তা এবং মানবসত্তা উভয়ই পরমসত্তায় বিধৃত থাকা সত্ত্বেও পরমসত্তা উভয়েরই উর্ধ্বে। তিনি জাগতিক সত্তা এবং আত্মিক সত্তার মধ্যে পৃথকীকরণ করেছিলেন। ইয়েসপার্স দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলে, মানবসত্তা জগতসত্তা থেকে স্বতন্ত্র হলেও জগতসত্তা ভিন্ন মানুষের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। জগতই মানুষের একমাত্র আবাসস্থল। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে মানুষ জগতে আসে, একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকে এবং পরিশেষে পরলোক গমন করে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষ তার সচেতন চেষ্টার দ্বারা তার সুপ্ত ক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলোর বাস্তব রূপায়নের ভিতর দিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে পারে, যে কাজ মানুষ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা প্রাণীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের মতো তাদের কোনকিছু হবার আকাঙ্খা নেই। মানুষ ব্যক্তি জীবনে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং এই অর্থে সে স্বাধীন। মানুষের জীবন সীমিত হলেও অনন্ত সম্ভাবনাময়। অনন্ত সম্ভাবনাময় মানুষের সমস্ত সুপ্ত ক্ষমতাগুলোর পূর্ণ বাস্তব রূপায়ন সম্ভব নয়। ফলে তার নিজের স্বরূপ নিজের কাছেই অনেকাংশে রহস্যবৃত্ত থেকে যায়, বহির্জগত সম্পর্কে তার জ্ঞানের তুলনায় তার নিজের সম্পর্কে জ্ঞান নিতান্ত স্বল্প। কার্ল ইয়েসপার্সের মতে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয় নয়। তাছাড়া বস্তু সর্বদাই ব্যক্তি অতিরিক্ত সত্তা হওয়ায় দুয়ের মধ্যে একটি বাহ্যিক সম্পর্ক থেকে যায়, ফলে ব্যক্তি ও বস্তুর এই ধরণের সম্পর্কজাত জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর প্রকৃত রূপ বিকশিত হয়নি। ব্যক্তি হিসেবেই প্রত্যেক ব্যক্তি এব একটি অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ পৃথক সত্তা এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবনের লক্ষ্য

নির্বাচন করতে পারে। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কার্ল ইয়েসপার্স তাঁর রচিত The Perennial scope of philosophy- গ্রন্থে বলেন:

> 'Conscious of his freedom man desires to become what he can should be. He conceives an ideal of his nature.' [Karl Yaspar's. 1950 : 16]

কিন্তু তার স্থির জীবনে অনন্ত সম্ভাবনাগুলোর পূর্ণ বাস্তব রূপায়ন অসম্ভব হওয়ায় জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছার সঠিক পথ সে নির্ণয় করতে পারে না এবং চরম লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও এর স্বরূপ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা থাকে না। ফলে সে সারাজীবন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। মানুষের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে কিয়েৰ্কেগার্ড বলেন :

> 'All ideals of man are impossible. Because man's potentialities are infinite. There can be no perfect man.' [Ibid, P.70]

ব্যক্তি মানুষের জীবনে সব লক্ষ্য বাস্তবায়ন হওয়া অসম্ভব। একদিকে তার পূর্ণতা লাভের অদম্য আকাঙ্খা, অপরদিকে তার আন্তর্নিহিত অপূর্ণতাজনিত অনিবার্য ক্ষমতা, এ দুয়ের দ্বন্দ্বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার মনের রণক্ষেত্র, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হতাশা। এরূপ দুর্বিসহ অবস্থায় হতাশাপূর্ণ ব্যক্তি পরমসত্তার আশ্রয় কামনা করে, যা বিভিন্নভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, যা লক্ষ্যমতে নিরাকার।

কার্ল ইয়েসপার্সের মতে, পরমসত্তা ঈশ্বর চরমতত্ত্ব এবং মানুষের জীবনের পরম আদর্শ। সসীম ও স্থির ব্যক্তি মানুষ তাঁর নিজের চেষ্টায় পরমসত্তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে পরমসত্তায় বিশ্বাস হারিয়ে দৃশ্যমান জগতকে বাস্তব বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি চরম হতাশা, যা গভীরভাবে মানুষের বৌদ্ধিক ও অন্তদৃষ্টিকে প্রভাবিত করে, ফলে জন্ম নেয় এক বিশেষ শক্তির, যাকে বলা হয় বিশ্বাস। চরম হতাশার মুহূর্তে বিশ্বাসই তার মুক্তিলাভের শেষ অবলম্বন। জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের অনুগামী দার্শনিক কার্ল ইয়েসপার্স মনে করেন ঈশ্বর অজানা। বুদ্ধি ও বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণের অতীত এই লোকোত্তর ঐশী সত্তার জ্ঞান অসম্ভব। আবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ ও অ-প্রমাণ করা যায় না। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কিংবা না করা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছার উপর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যক্তিগত অপূর্ণতার উর্ধ্বে উঠেও ঐশী সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে। অবশ্য অন্তরে দার্শনিক বিশ্বাস পোষণ করলেও যে কোনো মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পারে। দার্শনিক বিশ্বাস বিচারসিদ্ধ। জাগতিক অপূর্ণতার বিপরীতে পূর্ণসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসই দার্শনিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাস কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আরোপিত নয়, কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস বিচারসিদ্ধ নয়। কান্টের মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাঁরা ঐহ্যিক অপূর্ণতার বিপরীতে পূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন মাত্র। অপূর্ণ জগতের চরম উৎস 'পূর্ণসত্তা', এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায়। লোকোত্তর অতীন্দ্রিয়, অতএব অরূপ তত্ত্বের রূপ-বর্ণনা করা অসম্ভব, তাঁর অস্তিত্বের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দৃশ্যমান এই জগতকে সন্দেহ করা যায় না। জগত বাস্তবে প্রদত্ত এবং এটা ঘটনামাত্র। অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি হিসেবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মবিকাশের একমাত্র ক্ষেত্ররূপে জগতে বাস্তবতা সন্দেহাতীত। সব মানুষই ভিন্ন রকম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তিনি সর্বজনীন চিরন্তন লক্ষ্যের কথা বলেননি। এ ধরণের কোন উদ্দেশ্যলাভের প্রচেষ্টার মধ্যেই ব্যক্তিজীবনের মূল্য নিহিত আছে, তাও তিনি মনে করেননি। তিনি সোরেন কিয়েৰ্কেগার্ডের মতই বলেছিলেন নীতিভিত্তিক ধর্মীয় জীব-যাপনের মধ্যেই ব্যক্তিসত্তা তার স্বরূপ খুঁজে পায়। কার্ল ইয়েসপার্স, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তিনি ঈশ্বরকে এক তত্ত্ব বলে মনে করতে পারেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাছাড়া তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের

ধারণা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু যা কিছু যুক্তিসিদ্ধ তাই সর্বজনীন এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ। তবে ইয়েসপার্স স্পষ্ট করে বলেননি যে, মানুষ ইচ্ছা করলে তার নিজস্ব প্রয়োজনে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে, ভাষান্তরে, তার ঈশ্বরে বিশ্বাসকে দুঃখমুক্তির পথ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে যুক্তিকেও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে। কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেসব যুক্তির বিরোধীতা করা অসম্ভব, একথা বলা যায় না। কার্ল ইয়েসপার্সের মতের আলোকে বলা যায় যে, প্রত্যেক মানুষ এক একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় গতিশীল সত্তা এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবনের আদর্শ নির্বাচন করার ক্ষমতা মানুষের আছে। ইয়েসপার্সের চিন্তাধারা 'দার্শনিক বিশ্বাসের' পথ প্রশস্ত করেছিল, যা বস্তুগত জ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। আবার একে ব্যক্তিসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীও বলা যায় না। যদিও অতীন্দ্রিয় জগত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। cipher's-র সাঙ্কেতিক দর্শন সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সোরেন কিয়ের্কেগার্ড এবং কার্ল ইয়েসপার্সের মতই গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯-১৯৫৮) একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক। তথাপি জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। মার্সেলের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সে প্রাথমিকভাবে সেসব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তা সমাধান কর্তা এবং উদিষ্ট সমস্যাটি সমাধানের বিষয়। প্রথম চিন্তন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিসত্তা এবং বিষয়ের মধ্যে একটি বাহ্যিক সম্পর্ক থাকে। মার্সেলের পথ অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, প্রথম স্তরে আমাদের চিন্তা বহির্মুখী এবং বিশ্লেষক চিন্তা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের চিন্তা অন্তর্মুখী এবং সংশ্লেষক। চিন্তার এই গভীরতম রূপটিকে মার্সেল বলেছিলেন নিগুঢ়তত্ত্ব। সমস্যা যখন নিগুঢ়তত্ত্বে পরিণত হয় তখন বক্তিসত্তা এই সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সমস্যাটি ব্যক্তিসত্তার অন্তরে স্থান পেলে অন্তর্মুখী সংশ্লেষক চেতনার উপলব্ধির বিষয়রূপে গণ্য হয়। এটি ছিল মার্সেলের কাছে নিগুঢ়তত্ত্ব। "নিগুঢ়তত্ত্ব" প্রসঙ্গে Copleston তাঁর Contemporary Philosophy - গ্রন্থে বলেন :

> 'Mystery' is neither revealed truth, nor the unknown. The word is used to refer to that which is given in experience but which cannot be objectified in such a way that the csubject can be disregarded.' [Copleston, 1965:167]

মার্সেলের মতে, সত্তাকে বিষয়গত ও সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অনুভূতির ক্ষমতা সৃষ্টি হয় চিন্তার জগত থেকে সত্তার জগতে উত্তরণের মাধ্যমে। ব্যক্তির চিন্তার উপলব্ধি ঘটে অন্তরের গভীরে, সত্তাকে পাওয়া যায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। খ্রিস্টীয় ধর্মমতে, পরমসত্তা ও ঈশ্বর অভিন্ন এবং তা কোন সমস্যা নয়, রহস্য। "ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৌদ্ধিক যুক্তিবিচারের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়" এই তত্ত্বে আস্তিক অস্তিবাদী দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গ্যাব্রিয়েল মার্সেল বিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে, ঈশ্বর দৃশ্যমান জগতের কোন খন্ড সত্তা নয়, যার অস্তিত্ব যুক্তিবিচারের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়, বরং তাঁর অস্তিত্ব ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় অংশগ্রহণ, বিশ্বাস এবং একাত্মানুভাবের মাধ্যমে। আন্তরানুভূতির মাধ্যমে ঘটে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে পরমসত্তার যোগাযোগ। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসই মূলকথা। ঈশ্বরের উপস্থিতির উপলব্ধি অন্তরে, যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রমাণ করার কোনো প্রশ্ন উঠে না। তবে একথা সত্য যে, একজন ক্যাথলিক হিসেবে মার্সেল বিশ্বাস ও যুক্তিকে ঈশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। [সঞ্জীব ঘোষ, ১৯৮৬:৪৩] গ্যাব্রিয়েল মার্সেল New Testament-এর অনুসারী ছিলেন। তাঁর দর্শনের মূলকথা ছিল আনন্দ ও প্রেম, উদ্বেগ ও মনস্তাপ নয়। ফরাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন গ্যাবরিয়েল মার্সেল। সার্ত্রে এবং ক্যামুর দর্শনের নৈরাশ্যবাদী উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে তিনি 'আশাব্যঞ্জক' অধিবিদ্যা উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনে

অস্তিত্ববাদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং সার্ত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি মানবিক সম্প্রদায়ের রূপ দিয়েছিলেন, যা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বুবারের চেয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

অপরপক্ষে, জার্মান অস্তিত্ববাদী নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করেননি, যেমনটি ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্ট ব্যক্তিকে জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখে ঈশ্বরকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। ইয়েসপার্সের পরে যিনি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি সমকালীন অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম পুরোধা মার্টিন হাইডেগার। হাইডেগার তাঁর সমস্ত দার্শনিক চিন্তাকে সংহত করেছিলেন সত্তা ব্যাখ্যায়। তাঁর দর্শন প্রকৃতপক্ষে সত্তাবিশ্লেষণমূলক। জগতে মানবীয় ভূমিকা এবং মানব পরিস্থিতি ও তার নৈতিক মূল্যায়নের আলোচনা থেকে সচেতনভাবেই নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। জার্মান অবভাসবিজ্ঞানী এ্যডমন্ড হুর্সাল (১৮৫৯-১৯৩৮)-এর ভাব সম্পর্কিত ভাবনা থেকেই তিনি তাঁর দর্শনের বীজমন্ত্রটি পেয়েছিলেন। অবভাসবিজ্ঞানী হুর্সালের বিশ্বাস, মানুষের সত্তা একটি অনিবার্য সত্য এবং এই স্বত:সিদ্ধ থেকে তাঁর প্রসার। ব্যক্তিসত্তা নিজেই তার কাছে বস্তুসত্তা হবে কি করে এটি দর্শনের সমস্যা নয়। জগতে ব্যক্তিসত্তার কাছে কি করে বস্তুসত্তা হবে এটি ছিল তার কাছে দর্শনের মূল সমস্যা। কেমন করে সৃষ্ট হয় ব্যক্তিসত্তার কাছে এই বস্তুজগত, কেমন করে আসে তার সঙ্গে অর্থের অনুষঙ্গ, দর্শনের এসব মৌল প্রশ্নগুলোর সমাধান করার জন্য হুর্সাল এক নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করেছিলেন। সমকালীন দর্শনে তা 'Phenomenological Description' নামে পরিচিত। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে আধুনিক দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০), সংশয়বাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) এবং জার্মান বিচারবাদী দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর যোগ্য উত্তরসূরী বলা যায়। তবে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা হুর্সালের দর্শনের গাণিতিক বিশ্লেষণধার্মীতাকে অবশ্য উপেক্ষা করেছিলেন। স্বমুখীনতার তত্ত্বই তাঁদের বেশী আকৃষ্ট করেছিলেন। হাইডেগারও এ্যডমন্ড হুর্সালের দৃশ্যমান তত্ত্বে প্রবেশ করে প্রমাণ করেছিলেন আতঙ্কের অনুভাবেই ব্যক্তিসত্তা ও বস্তুসত্তার মাধ্যমে সীমারেখাটি চুর্ণ হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ সত্তা তার অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা নিয়ে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। সামগ্রিকতা প্রসঙ্গে Roger Scruton বলেন :

> 'It is in the feeting of anxiety according to Heidegger that the boundary between the subject and the object breaks down, to reveal pure being in this undifferentialed totality.' [Roger Scruton, 1979:72]

মার্টিন হাইডেগার সত্তার অর্থের প্রশ্নটি সামগ্রিকতা ও ঐক্যধার্মীকতার দিক দিয়ে বিচার করতে চেয়েছিলেন। হাইডেগার দেখিয়েছিলেন, যেহেতু সত্তার বাইরে আমি অবস্থিত নয় এবং সত্তার যে কোনো পরাদর্শন অন্তে মানুষেরই সৃষ্টি, সুতরাং মানব অস্তিত্বের স্বরূপ উৎঘাটনই তাঁর প্রথম দার্শনিক লক্ষ্য। এখন হাইডেগারের দর্শনের মূল সূত্রগুলোতে ফিরে আসি। তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ছিল 'Dasein'। জার্মান ভাষার এই শব্দটি হাইডেগারে দর্শনে একটি বহুল ব্যবহৃত পারিভাষিক অভিধা। হাইডেগারের দৃষ্টিতে মানুষ সম্ভাবনাময়। তার 'হওয়ার' ক্ষমতা আছে। সে হয়ে নেই। সে অনির্দেশ্যভাবে ও অসংখ্য উপায়ে হয়ে উঠতে পারে। এই বিভিন্ন সম্ভাব্য হওয়া থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত নির্বাচন করে চলেছে। মানুষের অস্তিত্ব আসলে হয়ে ওঠার নির্বাচন এবং এই নির্বাচন কখনই সর্বকালের জন্য অন্তিম নয়। তাঁর অস্তিত্ব তাই অনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতির একটি কাঠামো আছে। সেই কাঠামোটি হলো 'জগতে অবস্থিত সত্তা'। সমগ্র বস্তুজগত, প্রাণীজগত তথা অন্য মানুষের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিসত্তা। এই সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিসত্তাই হলো জগতে অবস্থিত সত্তা, যা মানুষ নামক জীবটির নিয়ামক। এ জগতের সঙ্গে যা কিছু উপায়ে আমার যোগ- আনন্দ, বেদনা, উৎকণ্ঠা, আশা, অভীপ্সা, রাগ, অনুরাগ, ঘৃণা, ভয়, উপযোগ, কর্ম- সবাই ব্যক্তিসত্তার

অস্তিত্বের প্রকৃতির দ্যোতিক। ব্যক্তিসত্তা যেকোনো ভাবে এসব আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত- সে কোনো অবিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। জগত মানুষের কাছে এ সমস্ত আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। দৃশ্যমান জগত সম্পর্কে John Passmore বলেন :

> 'The world is phenomenologically revealed to the human being as his world not in the sense of being the world which he perceives; but as being the world, he cares about, made up of thing which are useable or nuseable, hindrances or helps, potentially useful or troublesome.' [John Passmore, 1954:479]

এ জগত কেবল ব্যক্তিসত্তার কাছে পরিজ্ঞাত, সম্পর্কসূত্রে যুক্ত ও ব্যবহৃত হয়েই অর্থময় হতে পারে। জগতের অন্য কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তির 'জগতে অবস্থিত সত্তা' যেমন তার সম্ভাব্য প্রকল্প, ব্যবহারিক বস্তুগত ও অপর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত তেমনি অন্য যে কোনো মানুষের 'জগতে অবস্থিত সত্তা' ও অনুরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ। মানব অস্তিত্বের প্রকৃতির রয়েছে এই সার্বিকধর্মিতা। এর ফলে ব্যক্তি মানুষ সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, আচার, সংস্কার ও অভ্যাসের বশবর্তী। ব্যক্তিমানুষ এই সার্বিকধর্মিতার আশ্রয়ে নিরাপত্তা বোধ করে। মুক্ত সম্ভাবনাময় অথচ নিরাপত্তাহীন আত্মভাবকে মানুষ স্বেচ্ছায় এই আশ্রিত, নিরাপদ, অনুশাসনবিধৃত ব্যক্তিসম্পর্ক শূন্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিসত্তার কাছে বিসর্জন দেয়, আত্মভাবের প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হতে মানুষ ভীত হয়। কারণ, এই সংঘাত বিপজ্জনক এক বিস্ফোরণের মুখোমুখী করে দেয় মানুষকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অস্তিত্ব মানুষের ভাবমূলক অস্তিত্বের উপর একটি ধুম্রজাল বিস্তার করে। ব্যক্তিমানুষ অস্তিত্বের এই বন্ধদশার অনুভাবের মধ্য দিয়ে জগত ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে তার কর্মপন্থাও নির্বাচন করে। হাইডেগার তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীতি হয়েছিলেন- সত্তার প্রকৃতির দুই বিপ্রতীপ রূপ: একটি বিশুদ্ধ সত্তা, যা স্বীয় অস্তিত্বের পরিস্থিতিটি অনুভব করতে সক্ষম এবং অপরটি নিয়ম, আচার ও অনুশাসন শৃঙ্খলিত জগতে জড়যন্ত্রের মতো ক্রিয়াশীল বিমিশ্র সত্তা। মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্বে বিশুদ্ধ সত্তার প্রকাশ নেই। সেখানে ব্যক্তিসত্তা শুধু মানুষের স্বভাবে চলে। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্তা থেকে মানুষ কেন দূরে থাকে? হাইডেগার এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন 'আতঙ্কই' মানুষের বিশুদ্ধ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতার উৎস। এই 'আতঙ্ক' কোন বিশেষ কারণ থেকে সৃষ্ট নয়। এই আতঙ্ক সমগ্র অস্তিত্বে সঞ্চারিত। সমগ্র অস্তিত্বই এই 'আতঙ্কের' উৎস। এই 'আতঙ্ক' সমস্ত পার্থিব কর্ম, উদ্যোগ ও এ জগতের যা কিছুর সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের স্বীয় সত্তার যোগ, তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে এক নির্জনতার মুখোমুখী করে দেয়। 'আতঙ্ক' (Dreed) প্রসঙ্গে হাইডেগার তাঁর রচিত 'Existence and Being' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন :

> "The mood in which it meets this threat of and absolute nature is that 'Dreed'." [Heidegger, 1965: 78]

এই 'আতঙ্কই' সমস্ত পার্থিব কর্ম, উদ্যোগ ও এ জগতের যা কিছুর সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের স্বীয় সত্তার যোগ তা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে এক নির্জনতার মুখোমুখী করে। যেখানে সেই চরম অভিজ্ঞতায় নিজেকে প্রশ্ন করে। এই নিয়ম, অভ্যাস ও অনুশাসন-শৃঙ্খলিত ব্যক্তিসম্পর্ক শূন্য অস্তিত্বকে বহন করে নিয়ে যাবে, না কোনো দুঃসাহসিক প্রয়াসে এই ব্যক্তিসম্পর্ক শূন্য জীবনের অবয়ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ সত্তায় উদ্বোধিত করে তুলবে? কিন্তু এভাবে যে পন্থাই করা হয় না কেন, তার সত্তা হয়ে নেই, সে সব সমই হযে উঠবে, কারণ সে শুধু হয়ে উঠতে পারে এটাই তার প্রকৃতি। 'আতঙ্ক' অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থার নির্দয় নির্দেশক। হাইডেগারের চিন্তায় এই 'আতঙ্ক' একাধারে মানব অস্তিত্বের প্রকৃতির প্রকাশক (Dasein) এবং অস্তিত্বের বদ্ধদশার অনুভবও এই পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়ার উৎস। হাইডেগার মানব অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন :

> "Desein means being projected into nothing projecting into nothing, desein is dreadly what is totality this 'being beyond' what is we call transcendence.' [Ibid, P.370]

এভাবে মানব অস্তিত্বের প্রকৃতির একটি সংযুক্তি হাইডেগার দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি একে আখ্যা দিয়েছিলেন 'Sorge' নামে। Sorge শব্দটি জার্মান শব্দ, এর প্রতিশব্দ 'care'। এই সংযুক্তির তিনটি রূপ আছে। প্রথমত: ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত যে হয়ে নেই, সে হয়ে উঠবে, সুতরাং কাঠামোর দিক থেকে বিচার করলে এই অস্তিত্ব সর্বদাই নিজেকে অতিক্রম করে চলেছে। ভবিষ্যৎরূপী এই ব্যক্তিগত অস্তিত্ব যে জগতে রূপায়িত তার মধ্যে যে স্বীয় সত্তাটি রয়ে গেছে Sorge তাকেও সূচিত করে। তৃতীয়ত এই জগতের সঙ্গে নানা সম্পর্ক ও উপযোগের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে যে স্বীয় সত্তা Sorge তারও দ্যোতিক। 'Sorge' প্রসঙ্গে H. J. Blackham তাঁর Six Existentialist Theinkeres গ্রন্থে বলেন :

> "Care, Then, is the structure of the mode of existence of one who exists by antieipating what he will be in a world in which he is found and to which is bound" [H. J. Blackham, 1960: 132]

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হাইডেগারের দার্শনিক জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দু সত্তা, মানব অস্তিত্ব নয়, 'আমি আছি' এই বাক্যবন্ধটি যেমন মানবসত্তাকে ঘোষণা করেছে তেমনি জগতের সবজিকছুই 'আছে' এই শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা প্রকাশ সূচিত করেছে। মানব অস্তিত্বের মাধ্যমে সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে হাইডেগার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর অন্য একটি সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন সত্তা একমাত্র 'মানুষের' হতে পারে। দার্শনিক যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। প্রকাশই হচ্ছে সত্তার একমাত্র ধর্ম। হাইডেগার আরও বলেছিলেন ভাষাই প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে গ্রীকভাষায় চমৎকারিত্বের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন :

> "The Greek language is no more language like other European language. The Greek language and it alone is logos." [Martin Heideggar, 1956: 47]

হাইডেগার তাঁর তথ্যাবলীর বিশদ আলোচনা করেছিলেন Existence and Being নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থে সত্তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরাদর্শন নির্মাণ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। হাইডেগার তাঁর শূন্যতাকে সত্তারই আর এক প্রকাশ হিসাবে। এই শূন্যতা সত্তার প্রত্যনীক কোনো ধারণামাত্র নয়। এই শূন্যতা আমাদের অভিজ্ঞতায় লভ্য। হাইডেগার বলেছিলেন 'আতঙ্কই' এই শূন্যতার অভিজ্ঞতা। যুক্তি ও বুদ্ধি শৃঙ্খলিত ব্যক্তিগত অস্তিত্বের আস্তরণ ভেদ করে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রকৃত বিস্ময়কে যে অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করে তাই হলো শূন্যতা। মৃত্যুও এই বিশুদ্ধ অস্তিত্বের সূত্র। 'আতঙ্কের' অনুভাবেই ব্যক্তিসত্তা বস্তুসত্তার ভেদাভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায় আর বিশুদ্ধ সত্তা তার সামগ্রিকতা নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। স্বীয় অস্তিত্বের পরিস্থিতি যখন আমরা অনুভব করি তখন ব্যক্তি ভাবের ধ্বংসস্তুপ থেকে স্বীয় সত্তা ও তার স্বাধীনতাকে পুনর্জন্ম দেয় এবং বস্তুজগতকে পুনরায় সৃষ্টি করে। এভাবে হাইডেগার তাঁর অনন্য দার্শনিক চিন্তায় মানুষ ও জগতের মৌলিক রূপটি আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস, সভ্যতা ও জ্ঞানের আচ্ছাদনে মানুষ ও জগতের নিরাবরণ রূপটি এক প্রহিলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর দৃষ্টিতে সত্তার প্রকাশ তার ঐক্যে সামগ্রিকতায় ও তাৎক্ষণিকতায়। সত্তার এই প্রকাশই তিনি তাঁর নব্য দার্শনিক পরিভাষায় বিধৃত করতে চেয়েছিলেন। হাইডেগারের পর সমকালীন অস্তিত্ববাদী দর্শন একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শনে রূপায়িত হয়েছিল ফরাসী চিন্তাবীদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক জাঁ-পল সার্ত্রের অনবদ্য রচনায়। প্রতীচ্যের বিদগ্ধ সমাজে মূলত সার্ত্রের উপন্যাস ও নাটকগুলোই অস্তিত্ববাদী দর্শনের বার্তা পৌছে দিয়েছিল। তাঁর দর্শনের সূত্রগুলো

তিনি সর্বপ্রথম বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Being and Time' নামক গ্রন্থটিতে। ইয়েসপার্সের মতো হাইডেগার শূন্যতাবাদ দিয়ে তাঁর অস্তিত্ববাদী তত্ত্বের সমাপ্তি ঘটাননি। তাঁর মতে, 'শূন্যতা' অ-সত্তাকে সূচিত করলেও এটি এক প্রকার সত্তা। 'সত্তা' সম্পর্কে মার্টিন হাইডেগার বলেন : 'This wholly other to all entities is the non-entity. But this nothing essentiates as being.' [Martin Heideggert, 1969:45] এভাবে ধীরে ধীরে হাইডেগারের দর্শনে অ-সত্তা থেকে 'সত্তা'র ধারণা আবির্ভূত হয়েছিল এবং তাঁর পরবর্তীকালের দর্শন রচনাগুলোকে কিছুটা রহস্যময়, কিছুটা কাব্যধর্মী বলে মনে হয়েছিল। তবে সর্বত্রই তাঁর দার্শনিক ধারণা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সত্তা, চিন্তা এবং ভাষায়।

মার্টিন হাইডেগারের পর সমকালীন ফরাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সাহিত্যিক, নাট্যকার ও উপন্যাসিক এবং মনুষ্যজগতের নিকৃষ্টতম পন্থা প্রতীচ্যের সমকামিতার জনক জ্যাঁ-পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০)-র অনবদ্য রচনায় অস্তিত্ববাদী দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসাবে রূপায়িত হয়। প্রতীচ্যের বিদগ্ধ সমাজে সার্ত্রের উপন্যাস ও নাটকগুলোই অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর দর্শনের মূল সূত্রগুলো তিনি প্রথম বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Being and Nothingness' নামক গ্রন্থটিতে। সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে এ গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ভাবনার প্রথম পরিচয় পাওয়া তাঁর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'Nausea' নামক উপন্যাসে। তিনি হুর্সাল ও হাইডেগারের দর্শন থেকে তাঁর বিশিষ্ট অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রথম অনুপ্রেরণা অর্জন করেছিলেন। [Joseph P. Fell, 1958:23] হাইডেগারের অনুসরণে তাঁর দর্শনেরও বিকাশ সত্তাকে কেন্দ্র করে। তাঁর দর্শনের সূত্রগুলো আলোচ্য প্রবন্ধে অনুধাবন করার চেষ্টা করবো। চেতনা নিরবলম্ব নয়, এই চেতনা বললেই মানুষ বুঝে কোনো বস্তু সম্পর্কে চেতনা। সত্তার দুই পৃকৃতি এক অসেতুসম্ভব 'ব্যবধান' দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। এই চেতনা সম্পর্কেও মানুষ আবার সচেতন। চেতনা যেমন নিজেই নিজের বিষয় হতে পারে না তেমনি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া চেতনার উপস্থিতি অকল্পনীয়। সুতরাং চেতনা সমগ্র মানব অস্তিত্বের কাছে শূন্যরূপে বিদ্যমান। সত্তার প্রকৃতি চেতনা ও তার বিষয়, সার্ত্রের পরিভাষায় Poor-Soi এবং En-Soi। একদিকে চেতনা বিষয় নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আবার অন্যদিকে বিষয়নির্ভর। সত্তার দুই প্রকৃতি এক অসেতুসম্ভব 'ব্যবধান' দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। সত্তার এই দুই পত্যনীক রূপ তার দুই প্রকৃতির মধ্যে যোগের পথে অন্তবায় এবং সমগ্র জড়বাদী ও ভাববাদী দর্শনের প্রহেলিকার উৎস। সার্ত্রের মতে, চেতনার অর্থ বিষয়ের চেতনা এবং স্বচেতনাও। চেতনা ও তার বিষয়ের এই সম্পর্কই মানুষের সমগ্র জ্ঞান ও কর্মের উৎস। সার্ত্রে তাঁর অনন্য সাধারণ দার্শনিক যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে চেতনা ও তার বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। সার্ত্রে দৃশ্যমান জগতের বাইরে কোনো অতিক্রমী সত্তার অস্তিত্বের পরিকল্পনা করেননি। দৃশ্যমান জগত ও মৌলিক সত্তার পার্থক্য অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন বস্তুর স্বরূপেই মানুষ তার দৃশ্যমান রূপ অর্জন করে। বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে Sorge' প্রসঙ্গে H. J. Blackham তাঁর Six Existentialist Theinker's গ্রন্থে বলেন :

> "Things are entirely what they appear to be and behind them there is nothing"
> [H. J. Blackham, 1956 : 142]

দৃশ্যমান জগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎস। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য লক্ষিত হয় শুধু এ কারণে যে বস্তু অসংখ্য ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমষ্টি। কোনো বস্তুর গুণ ব্যক্তিসত্তা নির্ভর নয় বা বস্তুর মধ্যে সংশ্লেষিত নয়। বস্তুর সামগ্রিকতা নিয়েই চেতনার উপস্থিতি। যেহেতু চেতনা ইচ্ছা সম্পর্কিত তাই বস্তুর সমস্ত দিকই মানুষের সামনে একই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয় না। জার্মান অবভাস বিজ্ঞানী ফ্রাঞ্চ ব্রেন্টানো ও তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র জার্মান অবভাসবিজ্ঞানী এ্যাডমন্ড হুর্সালের মতো সার্ত্রেও বলেছিলেন যে

চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের একান্তই স্ব কামনা ও বাসনা। আলোর মতই ইচ্ছাময় চেতনা ছড়িয়ে পড়ে বস্তুজগতের ওপর। বস্তুজগতের উপর এভাবে চেতনার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও তার নিজ সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতাই আত্মভাব। এই আত্মভাবমূলক সত্তার অস্তিত্ব আছে বলেই জাগতিক সত্তাসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে পারে। সত্তাসার অস্তিত্বের অনুবর্তী। বস্তুর সমস্ত গুণই প্রকৃতপক্ষে আরোপিত। 'আমি আছি' এটাই একমাত্র সত্য, যা আছে সব কিছুই অবাস্তব, সার্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'De trop'। অস্তিত্বের মধ্যে কোনো আবশ্যিকতা নেই। অস্তিত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মানুষ মিলিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে তাঁর 'Nausea' উপন্যাসে বলেন :

> "I mean that by definition existence is not necessity. To exist is simply to be there. What existis apear's, lets itself be excountered but you can never deducs it." [Jean-Paul Sartre, 1965: 188]

যুক্তি বা মানস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সূচিত হওয়ার পূর্বেই বস্তুটির অস্তিত্ব মানুষের চেতনায় উপস্থিত। এই অস্তিত্বের কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই অস্তিত্ব নিজেই নিজের জিজ্ঞাসা, সম্পূর্ণ মৌল এবং অহেতুক। কান্টের মতো সার্ত্রে বস্তুজাগতিক জ্ঞানকে আপেক্ষিক মনে করেননি। তাঁর মতে, চেতনারূপী যে পৃথক সত্তা জগত সৃষ্টি করেছে এ জ্ঞান সেই চেতনারই জ্ঞান। এছাড়া অন্য কোনো জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই। জড় ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি যেহেতু জ্ঞানের প্রথম বিষয় সেহেতু দার্শনিক বিচারে এই জ্ঞানের ভিত্তি অসঙ্গত। বস্তুবাদী কিংবা ভাববাদী দর্শন এই সম্পর্কের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। হাইডেগারও ভাববাদী দর্শনের দ্বার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। ব্যক্তিসত্তা যেমন তাঁর কাছে বস্তুসত্তা হতে পারে না। তাই অপর সত্তা ব্যক্তিসত্তা হিসেবে তার কাছে বস্তুসত্তা হতে পারে না। সে স্বীয় সত্তাকে অপর সত্তার বিষয় হিসেবেই অনুভব করে, বস্তুসত্তা হিসেবে নয়। সে শুধু তার সমগ্র অতীত বা তার অপ্রমেয় সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নয়, সে অপরের বস্তুসত্তাও। অন্যদের দেখার মধ্যে তার স্বীয় সত্তা বস্তুসত্তা হিসেবে তার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূক্ত হয় এবং এই অভিজ্ঞতায় অপর সত্তার বিষয়ী রূপটিরও পরিচয় অর্জন করে। তার বিষয়ীরূপটিও লুপ্ত হয়ে যায়। স্বীয় চেতনায় লজ্জা, অপমান অপর ব্যক্তিসত্তার বিষয় হিসেবে অনুভূত হয়, একথাও সার্ত্রে উল্লেখ করেছিলেন। সার্ত্রে আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, স্বীয়সত্তা যেমন অনন্ত সম্ভাবনাময়, অপর সত্তার কাছে তা সম্ভাবনাহীন। তিনি জড়বস্তুকে প্রায় সমগ্র জাতিসত্তার কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। জড়বস্তুকে ঘিরেই এই সমগ্র জগত আবর্তিত। জড়ের সীমানায় সবকিছুই অর্থময়। ভাব জড়বস্তুগত চেতনারই সমার্থক। জড়ের এই চেতনা জ্ঞানভিত্তিক নয়, জড়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত ইচ্ছা-কামনা-বাসনার সঙ্গে অভিপ্রায়। এই চেতনায় মানুষের অনিশ্চিত অস্তিত্বের জন্ম দেয়। সার্ত্রে তার 'Nausea' উপন্যাসে বলেছেন- অস্তিত্বের একান্ত বাস্তবতা হলো মানুষের অনিশ্চিত অস্তিত্বের অনুভূতির প্রতিক্রিয়া। স্বীয় সত্তাকে অপর সত্তার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ করেই সার্ত্রে ক্ষ্যান্ত হননি। যৌন সম্পর্কের মধ্যে তিনি এই সম্পর্কের রহস্য অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে, যৌন কামনাময় প্রেমই স্বীয় সত্তা অপর সত্তার স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বকে বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। অপর সত্তার স্বাধীন চেতনায় স্বীয় ব্যক্তিসত্তাকে অপর সত্তার বস্তুরূপে প্রতিভাত করেছে। স্বীয় কামনা-অভীপ্সা বস্তুত স্বীয় সত্তাকে অপর সত্তার প্রেমবস্তুতে পরিণত করার ইচ্ছা। কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবর্তী হয়নি। [Ibid, P.189] সত্তার আত্মবিস্তারের পথ স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। কারণ, অপরসত্তাও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার মুক্তি কখনই অধিকৃত হতে পারে না। সার্ত্রের মতে, প্রেম ও ঘৃণা এই দুই মৌল অনুভূতিকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্যান্য জটিল অনুভূতি আবর্তিত হয়। কিন্তু এই দুই মৌল অনুভূতির অন্তে ব্যর্থতাবোধ ও হতাশায় আক্রান্ত। তাই স্বীয় সত্তার কাছে অপর সত্তা চির অনধিগম্য। অপরসত্তার স্বাধীন চেতনা অজ্ঞেয় অথচ অপর সত্তাকে যদি তার বিষয়বস্তু হিসেবে দেখানো যায় তাহলে জগতের সমস্ত মানুষই তার কাছে বস্তুপুঞ্জে পরিণত হবে। এই জগতে ব্যক্তিসত্তার একাকীত্বের কারণে আত্মপ্রতারণার ফল মারাত্মক হয়ে উঠে।

অনুক্ষণতা মানুষকে বিদ্ধ করে রাখে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত পাবার জন্য ব্যক্তিসত্তা মৃত্যুচেতনায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘৃণা থেকেই এই মৃত্যুচেতনার রূপান্তর। এই ঘৃণারও শেষ পরিণতি ব্যর্থতা ও হতাশা। সার্ত্রের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ছিল সংহতি নয়, সংঘাতই এক সত্তার সঙ্গে অপর সত্তার সম্পর্কের সার। স্বাধীন চিন্তায়ও ব্যক্তিসত্তার অবিচ্ছিন্ন আশ্রয়ে লালিত। সার্ত্রে মুক্তির কার্যকারণ নির্ধারণকে অস্বীকার করে স্বাধীন চেতনাকে চরম অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। এই স্বাশ্রয়ী মুক্তি সত্তার স্বরূপ চরম মুক্তি, পরম মুক্তি। এই চরম স্বাধীন চেতনার দ্বারাই মানুষ জগতকে বিভিন্নভাবে অনুভব করেছে এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছে। সার্ত্রের মতে, মানুষ ও জগত প্রতিনিয়তই যুগপৎ জন্ম নিচ্ছে। জগতের সঙ্গে যেখানে যোগ, স্বাধীন চেতনায় মানুষ তাকে সর্বদা অতিক্রম করে চলেছে। মানুষের হয়ে উঠা প্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গে Majoric Greene তাঁর 'An Introduction to Existentialism' গ্রন্থে বলেন :

> 'So self and the word are continuously born together, in the selfs free transcendence of its situation to form itself in relation to its world- a transcendence always already in process, yet always not accomplished.' [Majoric Greene, 1959:50]

ব্যক্তিসত্তা একাধারে তার ইচ্ছাবহির্ভূত পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন। কারণ, প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন না হলে স্বাধীনতার প্রশ্ন নিরর্থক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মুখোমুখী হয়েই ব্যক্তি তার স্বাধীন চেতনা দিয়ে সবকিছু গ্রহণ অথবা বর্জন করে। অর্থাৎ পরিবেশই মানুষকে তার স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষ তার প্রতিটি কর্মের জন্য নিজেই দায়ী, কারণ স্বীয় পরিবেশ তো তার স্বাধীন চেতনায় সে নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে মানব চেতনার রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। স্বাধীন চেতনার স্বরূপ সত্তা তার অতীত থেকে জগতের সঙ্গে নানা সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে। গতিশীল ব্যক্তিসত্তা হিসেবে মানুষের কর্মের আদি উৎস বিচ্ছিন্ন নির্ভর সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে 'Being and Nothingness' নামক গ্রন্থে বলেন :

> "I am not 'Free' to escape from the lot of my class, my nation, my family, not evento buildup my power or my fortune norto cconquer the least important of my appelites or my habits much more than appearing 'to make himself' man seams to be 'made' by climate and land race and class, language, the history of the collectivity of which he is part, heredity, the particular circumstance of his childhood. The great and little events of his life." [Jean-Paul Sartre, 1966: 561]

সার্ত্রে নিজেই এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে বলেছিলেন, বাস্তব জগতের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়াই স্বাধীনতার শর্ত। যা স্থির হয়ে আছে তাকে অতিক্রম করাই স্বাধীনতার শর্ত। স্বাধীনতার অর্থ বস্তু অধিগত হওয়া নয়, বৃহত্তর অর্থে স্বাধীনভাবে জীবনের পথ ও কর্মপন্থার নির্বাচন। এই নির্বাচন অনুযায়ী ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার অর্থই মানুষ বাস্তব জগতে সহস্র বাধার সম্মুখীন ও প্রতিহত হবে। স্বাধীনতাস্বরূপ চেতনা কার্যত অনুশাসন, প্রচলিত আচার ও অভ্যাসজীর্ণ সীমিত জগতে অসহায় বন্দী, যা স্বাধীনচেতনা এক অনপনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। আবার অপর সত্তার উপস্থিতিও তার স্বাধীনতাকে সীমিত করে। সার্ত্রের মতে, মানুষ কোনো বিশেষ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, এক সর্বব্যাপী স্বাধীনতাস্বরূপে তার অধিষ্ঠান। মানুষের অবস্থান শূন্যতারূপে। কারণ, মানুষ নির্দিষ্ট কোনো কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাই স্বাধীনতা স্বরূপ হতে পারে না। সার্ত্রের ভাষায় মানুষ এক 'Useless Passion' এবং অনর্থক, 'absurd'। মানুষের চেতনায় সৃষ্ট জগত অর্থময়, জগতের অন্য কোনো অর্থ নেই। চরম স্বাধীনতার আশ্রয়ে মানুষের উপর জগতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মানুষের চেতনায় এই দায়িত্বই এনেছে গভীর উৎকণ্ঠা, অভিশঙ্কা, আতঙ্ক ও শূন্যতাবোধ। স্বাধীনতা তাই ভয়ংকর। মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে এক বিশৃঙ্খল অবিন্যাস্ত জগতে শৃঙ্খলা ও বিন্যাস তারা অকারণেই নিজ

নিজ চেতনায় এনেছে তখনই জাগতিক নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং বিন্যাস মানুষের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে হয়। এই বিরাট শূন্যতা থেকে মানুষের চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে অর্থহীন কাল্পনিক এক জগত। এ জগত শুধু মানুষের স্ব-আরোপিত অর্থে অর্থময়। এই চেতনায় মানুষকে সেই ভয়াবহ শূন্যতার মুখোমুখী করে দেয়। মৃত্যুচেতনা এরই প্রকাশ। হাইডেগারের দর্শনেও মানুষ এই মৃত্যুচেতনার সাক্ষাৎ পায়। তাঁর মতে, মানুষের স্বাধীন চেতনা মৃত্যুচেতনার দিকে বহমান এবং এই মৃত্যুচেতনায় মানুষের প্রত্যহ অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে স্বীয় স্বাধীন সত্তাকে স্পর্শ করে। সার্ত্রে তাঁর মৃত্যুচেতনার ধারণাকে ব্যক্তিচেতনার ধারণা থেকে মুক্ত করে সমগ্র মানবতার ধারণারূপে দেখেছিলেন। তিনি মনে করেন মৃত্যু জন্মের মতোই একটি বিশুদ্ধ ঘটনামাত্র। ব্যক্তি মানুষের মুক্ত চেতনা যেমন অপর মানুষের মুক্ত চেতনার দ্বারা সীমিত, তেমনি তার মৃত্যুচেতনাও ব্যক্তিরূপী চেতনার পরিসীমা। ব্যক্তিগত মৃত্যুর আতঙ্ক তাই তাঁর দর্শনে অপাংক্তেয়। মৃত্যুচেতনা নয়, প্রকৃতপক্ষে মুক্ত চেতনায় মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর। এই মুক্ত চেতনায় মানুষকে অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে যে মানব চেতনায় সৃষ্ট মূল্য দিয়ে গড়া জগতই আসল জগত, যা নিজ চেতনায় সৃষ্ট মূল্য এক সর্বব্যাপী শূন্যতা থেকে আহৃত। এই সৃষ্ট মূল্য মানুষের কাছে নিয়ে আসে এক ভয়ঙ্কর শূন্যতাবোধ। যে কারণে মানুষ নির্বাসিত হয় ভয়ঙ্কর স্বাধীনতার জগতে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে 'Being and Nothingness' নামক গ্রন্থে বলেন :

> "I emerge alone and indread in the face of the unique and first project which constitutes my being, all the barriers, all railing collapse, annihilated by the consciousness of my liberty; I have not nor can I have recourse to any value against myself; Cout of from the eorid and essence by nothing that I am. I have to realize the meaning of the worid and of my essence. I decide it alone, unjustifiable and without excuse." [Jean-Paul Sartre, 1966: 76-77]

সার্ত্রের দর্শন মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের দর্শন। তাঁর দৃষ্টিতে এ জগত মানবকেন্দ্রিক এবং মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণতার সম্মুখীন। সমগ্র মানবিক মূল্যবোধ ও স্বাধীনতাস্বরূপ চেতনারই সৃষ্টি। তিনি সত্তার জটিলতা থেকে চেতনাকে স্বাধীন রেখেছিলেন নিপুণ বিশ্লেষণে। চেতনা তাঁর কাছে আলোর মতো। আলো যেমন বস্তুজগতকে দৃশ্যমান করে তোলে তেমনি চেতনা জ্ঞানের প্রকাশকে বিকশিত করে চলেছে। বস্তুজগতের সঙ্গে চেতনা সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। অথচ বস্তুজগত থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে চেতনার অস্তিত্ব অসম্ভব। সমগ্র মানবীয় জ্ঞান ও কর্মের শর্তই চেতনার এই বিচ্ছিন্নতা। এই দ্বিমাত্রিক ব্যপ্তিই সার্ত্রের কাছে চেতনার স্বরুপ । তিনি বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী দর্শন থেকে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে দূরুত্ব রক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের মতে, সার্ত্রে বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী উভয়ই। সার্ত্রে চেতনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে তাঁকে বস্তুবাদী বা ভাববাদী হিসাবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। সার্ত্রের চেতনা বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে অধিক কৌশলগত এবং দার্শনিক বিচারে যথেষ্ট তর্কের অপেক্ষা রাখে। তথাপি দার্শনিক বিশ্লেষণগত কৌশল যাই থাকুক না কেন, এক অনন্ত সাধারণ মানবতাবোধ তার দর্শনের আপাত দুর্বোদ্ধতার অন্তরালে জলদচিরেখার মতো ভাস্বর। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ জগতের সকল মানুষের সামনে রেখেই প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা তার ভবিষ্যৎ সংকল্প গ্রহণ করে, যাকে বলা যায় ব্যক্তিগত অস্তিত্বের স্বরুপ। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে বলেন : "In fashioning my self I fashion man." [Sartre 1950 : 30] সার্ত্রের দর্শন ব্যক্তিগত অস্তিত্বের দর্শন হয়েও মানবতাবাদী জীবন দর্শনে উত্তীর্ণ। তাঁর মতে, অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তিগত অস্তিত্বের দর্শন এবং মানুষ এ জগতের স্রষ্টা। জগত মানবসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও এই জগতের সঙ্গে মানুষের এক নিবিড় যোগ রয়েছে, এই চেতনা থেকেই তার দর্শনের জন্ম। কান্টীয় দৃষ্টিতে এই বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাধর্মী প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে অবশ্য স্বীকার্য বিভাজন রেখারই পরিণাম। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাধর্মী এই দৃশ্যমান জগত বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ যুক্তির সার্বিক সংজ্ঞার দ্বারা শাসিত। জার্মান

দার্শনিক উইলহেলম হেগেল ঐতিহাসিক ধারণা ও বাস্তবের সম্মিলন সম্ভব মনে করেছিলেন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে তিনি ইতিহাসের সমগ্র মানব অস্তিত্বতে অঙ্গীভূত করার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা মানুষ জগতের মধ্যে বিচ্ছেদকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন। তাঁদের মতে, দার্শনিক চেতনায় বিচ্ছিন্নতাকে বৃহত্তর ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থই ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা হেগেলীয় দর্শনকে মূলত দুটি কারণে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রথমত: তাঁদের মতে, ইতিহাস বস্তুত: ব্যক্তি মানুষের নিজ নিজ কর্ম, চিন্তা ও এষণার সমষ্টি, যা ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীন চেতনায় এই ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। ইতিহাসের কোনো নির্ধারিত নিয়মে ব্যক্তিসত্তা চালিত নয়। ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীন চেতনায় অন্যান্য মানুষের সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা গ্রহণ বা বর্জনের পূর্ণ অধিকারী। দ্বিতীয়ত:জ্ঞান অতীতের আংশিক জ্ঞান মাত্র। ব্যক্তিমানুষের সামনে রয়েছে উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ। এই উন্মুক্ত ভবিষ্যতই মানুষের অপ্রমেয় সম্ভাবনা। কিন্তু হেগেলীয় দর্শনে মানুষ নির্ধারিত, একটি চূড়ান্ত প্রজ্ঞার মধ্যে তার স্থান নির্ধারিত। অস্তিত্ববাদীরা কান্টের বিমূর্ত সার্বিক সংজ্ঞার তত্ত্ব গ্রহণ করেননি, কারণ মানুষের এমন কোনো সারসত্তা নেই যা সর্বনিয়ন্ত্রক। কোন দার্শনিক পদ্ধতি দ্বারা মানুষ ও তার জগত সম্পর্কে সমগ্র সত্যকে নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানুষের স্বাধীন চেতনার কাছে সমস্ত দার্শনিক কৌশল অর্থহীন। [Willam Barrett, 1961: 144] তাই দর্শনের আবহমান সমস্যাগুলোর সমাধান অস্তিত্ববাদীদের কাছে মৌলিক নয়, ব্যক্তিগত অস্তিত্বকরণই তাদের মূল লক্ষ্য। দর্শন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে তাঁর 'What is Literature' নামক গ্রন্থে বলেন:

> "Mataphysics is not a sterile discussion about abstract notions which have nothing to do with experience. It is a living effort to embrace from withing the human condition in its totally." [Jean-Paul Sartre, 1950: 163]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতীচ্যের সংস্কৃতিতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। গল্প, সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, শিল্পকলা, মনস্তত্ব এবং সমাজদর্শন এমনকি প্রত্যহ জীবনযাত্রা পর্যন্ত অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। তৎকালীন সময়ে প্রতীচ্যের সংস্কৃতিতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাবের মূল্যায়নের গুরুত্ব ছিল না। সমকালীন ভাষা দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল ভিত্তি এবং জার্মান অবভাসজ্ঞানী এ্যডমন্ড হুর্সালের বিশুদ্ধ অবভাসতত্ত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় মানসিক অবস্থাগুলো বহির্জগতের বৈশিষ্ট্যরূপে উন্মেষ ঘটে বলেই বক্তিসত্তার উদ্ভব সম্ভব। বস্তুজগত সম্পর্কে কোন অনুমান ব্যতিত তাৎক্ষণিক বস্তুর বর্ণনা করার ভাষা রচনা প্রকৃতপক্ষে একটি অসম্ভব প্রতিপাদ্য। ভিটগেনস্টাইনের মতে, একান্ত 'ব্যক্তিগত ভাষা' অসম্ভব। হুর্সালের 'বিশুদ্ধ অবভাসতত্ত্ব' তাই তাঁর কাছে একটি অর্থহীন তত্ত্ব। হুর্সালের 'বিশুদ্ধ অবভাসতত্ত্ব'কে অস্বীকার করলে হাইডেগার ও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাকে অন্ততঃ কোন সুসংহত দর্শনতত্ত্ব আখ্যা দেওয়া যায় না। অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের দর্শনের অভিযোগ ছিল এই যে, অস্তিত্ববাদীরা মানবীয় অস্তিত্বকে যথার্থভাবে ব্যাখা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, অস্তিত্ববাদীদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা জগতে অবস্থিত সত্তা। আত্মগত ভাববাদীদের মতো তাঁরা ভাবজগতের প্রতি বিশ্বাসী নন। তাঁরা দৃশ্যমান জগতের বাস্তবতা স্বীকার করে জগতকে অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নিজের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে প্রতিটি মানুষের পক্ষে একই জগতে অবস্থান করা সম্ভব বলে অস্তিত্ববাদীরা এর যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিয়েের্কেগার্ডের মতে সত্য ব্যক্তি সাপেক্ষ। তিনি নীতি, ধর্ম এবং বস্তুগত অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সত্যের কথা বলেছেন। হেগেল যেমন যুক্তিকেই মানুষের জীবনে সর্ব্বোচ্য স্থান দিয়েছিলেন তেমনি কিয়ের্কেগার্ড আবেগ ও অনুভূতিকে মানুষের

জীবনের মৌলিক দিক বলে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ শুধু যুক্তি, আবেগ এবং অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের সমস্ত মৌলিক উপাদানের যথাযথ মিশ্রণে সৃষ্ট মানবসত্তা। কিয়ের্কেগার্ড মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তাঁকে সমকালীন যুগের ধর্মভিত্তিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে ভূষিত করা হয়েছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাসী কার্ল ইয়েসপার্স মনে করেছিলেন যে, ঈশ্বরের ধারণা যুক্তিসিদ্ধ এবং যা কিছু যুক্তিসিদ্ধ তাই সর্বজনীন এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ। যুক্তিসঙ্গতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্যক্তি সাপেক্ষ। মানুষ ইচ্ছা করলে তার নিজস্ব প্রয়োজনে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সাপেক্ষে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করার জন্য সুদৃঢ়ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর দর্শনের মূলমন্ত্র ছিল পরমসত্তা বা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা। সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ও কার্ল ইয়েসপার্সের মতো গ্যাব্রিয়েল মার্সেলও ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন দার্শনিক। জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে কিছুটা স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। তিনি মনে করেন ঈশ্বরের ভিত্তিভূমি বাস্তব জগত। মানুষের অস্তিত্বের সচেতনতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্সেল বলেছিলেন 'আমার অস্তিত্ব আছে' একথা না বলে 'আমি প্রকাশিত হয়েছি' একথা বলা উচিত। [সঞ্জীব ঘোষ, ১৯৮৬:৩৭] এই অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে স্বাধীন মানুষের জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের ঐক্যতান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু যান্ত্রিক জগতের বিষাদময় জীবনে মানুষ বিভ্রান্ত, হতাশা-ক্লিষ্ট, ঐক্যবোধচ্যুত এবং খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস, প্রচারিত পূর্ণকর্ম, বিশ্বাস, আশা, প্রেম, দয়া, বিস্ময়, ঐক্য মানুষের জীবনের পূর্ণতা লাভে সহায়তা করতে পারে। তাঁর দর্শনের মূল মন্ত্রই ছিল ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের কল্যাণের জন্য পূর্ণতা অর্জন করা। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মার্টিন হাইডেগারের দর্শনের মূলমন্ত্রই ছিল মনবসত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। তিনি মানবসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুসমুহ অনুসন্ধান করেছিলেন। ব্যক্তিমানুষের বাস্তব অস্তিত্বের অর্থ তাৎপর্য ও মূল্য বিশ্লেষণ করে আত্মোপোলব্ধিতে সাহায্য করা হাইডেগারের দর্শনের মূলকথা। অপর নাস্তিক দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত্রের দর্শনের মূলমন্ত্র ছিল ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব, স্বাধীনতা এবং চেতনা। দৃশ্যমান জগত সত্য না হলেও জ্যামিতির কল্পনাগুলো অধিকতর সত্য ও সম্ভাবনাসূচক। যে সম্ভাবনা বাস্তবে দৃশ্যমান হয়ে দেখা দেয় তাই অস্তিত্ব। [পূর্বোক্ত : ৭৯] ব্যক্তিসত্তার সিদ্ধান্ত নেওয়া জীবনের সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার পক্ষে খুবই জরুরী তখন সে উপলব্ধি করে তার অস্তিত্ব। সার্ত্রের মতে, অস্তিত্ব একমাত্র মানুষের ধর্ম। যুক্তি ও বুদ্ধি শৃঙ্খলিত ব্যক্তিগত অস্তিত্বের আস্তারণ ভেদ করে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রকৃত বিস্ময়কে যে অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে তাই হলো শূন্যতা। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী চেতনার মূল লক্ষ্য মানুষ নিজেকে নিজ দায়িত্বে গড়ে তুলবে। চেতনার অভাববোধ ও শূন্যতার চেতনা মানুষকে কাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য সক্রিয় করে তোলে। যেমন 'আমি হতে চাই' 'আমি হয়ে উঠতে চাই' চেতনা সর্বদা গতিশীল, পরিবর্তনের আধার এবং প্রতিমূহুর্তে অতৃপ্ত ও অপূর্ণ। চেতনার ভিত্তি যে অভাববোধ তার নাম শূন্যতা। স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার একটি মৌলিক অধিকার। ব্যক্তিমানুষ সবকিছু থেকে মুক্ত হলেও স্বাধীনতা থেকে মুক্ত নয়। স্বাধীনতার সঙ্গে রয়েছে দূর ভবিষ্যতের অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা স্বাধীন। তাছাড়া সমগ্র জগতে ব্যক্তিসত্তা পরিত্যক্ত এবং জগতের কল্যাণ আনার দায়িত্ব একমাত্র মানুষেরই আছে। জগতে প্রাকৃতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু জগতে ভাল-মন্দ গড়ার দায়িত্ব মানুষ হিসেবে ব্যক্তিসত্তারও। স্বাধীনতার সঙ্গে এই দায়িত্ববোধ যুক্ত হয়ে ব্যক্তিসত্তার আবেগকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং স্বাধীনতা কোন আনন্দিত চেতনা নয়, অসুখী চেতনা। উদ্বেগ থেকে মুক্তির জন্য মানুষ অভিনয় করলেই চেতনাশীল সত্তা হয়, আর এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত না হলে পরাধীন অচেতন বস্তুতে পরিণত হয়। তাই ব্যক্তিসত্তা হিসেবে মানুষ স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। উদ্বেগ-ব্যথিতচিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যে স্বাধীনতা কামনা করে, ব্যক্তিসত্তা সেই স্বাধীনতা কামনা করে না, এটাই স্বাধীনতার প্রকাশ। জগতে অবস্থিত মানুষের অস্তিত্ব

বিনাশকারী মানবসৃষ্ট পারমানবিক অস্ত্রের যুগে পরম মানবপ্রেমের দর্শন হিসেবে অস্তিত্ববাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ :

ঘোষ সঞ্জীব, অস্তিত্ববাদঃ দর্শনে ও সাহিত্যে, (বেচ্যু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ. ২।

পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

রায় রবি, পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন, (সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৬৫), পৃ. ৭।

Barret William, Irrational Man: (William Heinemann Ltd, London, 1961), P. 144.

Blacham H. J., Six Existentialist Thinker's, (Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1955), P. 132.

Ibid, P. 142.

Chatterjee Satish Chandra, The problem of philosophy, (The University of Calcutta, 1954), P. 44.

Ibid, P. 44.

Copleston S. J., Contempura Philosophy, (Burns and Oates, London, 1965), P. 167.

Greene Majoric, An Introduction to Existenlialism, (Phoenix Books, The University of Chicago Press, 1959), P. 38.

Ibid, P. 50.

Heidegger Martine, Existence and Being, (Vision Press Ltd, London, 1956), P. 78.

Ibid, P. 370.

Heidegger Martin, What is Philosophy, (Vision Press Ltd, London, 1956), P. 47.

Jaspar's karl, The Perennial Scope of Philosophy, tr by Ralf Manheim; (Routledge and Kegan Paul Ltd. London, 1950), P. 16.

Ibid, P. 70.

Passmore John, A Hundred Year's of Philosophy, (Penguin Books Ltd; London, 1954), P. 69.

Ibid, P. 69.

Ibid, P. 479.

P. Full Joseph, Heidegger and Sartre: An Essay on Being and Place, (Columbia University Press, 1960), Pp.111-142.

Sartre Jean-Paul, Being and Nothingness, Tr by Hazel E. Barness, (Washington Square Press, New Yourk, 1966), P. 561.

Sartre Jean-Paul, Existenlialism and Humanism, Tr by Philip Mairit, (Methuen and Co Ltd., London, 1957) P. 30.

Sartre Jean-Paul, Nausea, (Penguin Books Ltd, London-1965), P. 188.

Ibid, Pp. 76-77.

Sartre Jean-Paul, What is Literature, (Methuen and Co Ltd, London 1950), P. 163.

Schopenhaur Arthur, The world As Idea, (Vission Press, London, 1934), P. 72.

Scruton Rogger, Analytical Philosophy, (Encunter, London, 1979), P.72.

Ibid, P. 189.

গ্রন্থপঞ্জী :

Copleston, Contempura Philosophy, Burns and Oates; London, 1965.

Existenlialism and Humanism, Tr by Philip mairet, Methuen and Co Ltd., London, 1950.

F. Nietzsche, Beyond Good and Evil, Vintage, New York, 1967.

H. J. Blacham, Six Existentialist Thinker's, Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1956.

Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, Tr by Hazel E. Barness, Washington Square Press, New Yourk, 1966.

John Passmore, A Hundred Year's of Philosophy, Penguin Books Ltd; London, 1954.

Joseph P. Full, Heidegger and Sartre, An Essay on Being and Place, Columbia University Press, 1958.

Karl Jaspar's. The Perennial Scope of Philosophy, tr by Ralf Manheim; Routledge and Kegan Paul Ltd. London, 1950.

Majoric Greene, An Introduction to Existenlialism, Phoenix Books, The University of Chicago, 1959.

Martine Heidegger, Existence and Being, Vission Press Ltd, London, 1956.

Martine Heidegger, what is Philosophy, Vission Press Ltd, London, 1956.

Nausea, Penguin Books Ltd, London-1965.

Rogger Scruton, Analytical Philosophy, Encunter, London, 1979.

Satish Chandra Chatterjee, The problem of philosophy, The University of Calcutta, 1964.

Schopenhaur, The world As Idea, Vission Press, London, 1939.

Soren Kierkegaard, Samledge Vaerker, Ed. A. B. Drachmann, 2nd Edition, Copenhagen, 1920-31.

What is Literature, Tr by Bernand Frechtman, Methuer and Co Ltd, London 1950.

William Barret, Irrational Man, William Heinemann Ltd, London, 1961.

রবি রায়, পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৬৫।

সঞ্জীব ঘোষ, অস্তিত্ববাদ: দর্শনে ও সাহিত্যে, বেচ্যু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮৬।

[**Abstract:** Existentialism is one of the most influential philosophical trends in the contemporary world. The existence and essence of individual human beings are the core concerns of this philosophical movement. From the ancient to the contemporary era, some philosophers, especially the essentialists, think that essence precedes existence, but according to existentialist philosophers, 'existence precedes essence'. For existentialists, existence is not static, but always a source of change. Every moment, the individual returns from one state to another. Existence extends towards the future it has not become; it will become; existence is always transcending itself. This individual existence is reflected in the future. Fear also indicates the self-being that remains in the

world in which individual existence is embodied. The self-made individual existence that is inextricably involved in various relationships and uses with this world is also the source of the dread of this existence. In this paper, I would like to analyze the relationships between individual human beings and the world in the light of existentialism.]